



পরের উপকার করিও না

প্রথম দৃশ্য

(চট্টোজনের ঘর)

ভজ্জহরি : (সজখাই গলার) আমার দলবল সব হাজির ? প্যালারাম ?

প্যালা : আছি ভজ্জালা ।

ভজ্জ : হাবুল সেন ?

হাবুল : ঢাকই ভজ্জার) এই তো তোমার সামনেই খাজুইয়া বইছি । দ্যাখতে পাও না ?

ভজ্জ : ক্যাকলা ?

ক্যাকলা : প্রজেন্ট সার !

ভজ্জ : (চটে) আবার ইংরেজী কেন গোমুখ্য ! ইংরেজ চলে গেছে, খাঁটি বাংলা কলবি এখন ! কল—হাজির আছি ভজ্জালা !

ক্যাকলা : আচ্ছা, তাই হলে হাজিরই বইলাম না হয় ।

ভজ্জ : নে, চল এবার । বেরিয়ে পড় চটপট ।

হাবুল : যাবা কই ? সিনেমায় নাকি ?

ভজ্জ : ই—সিনেমায় । পয়সা দেবে কে চাঁদ, শুনি ? সব তো টাকখালির জমিদার । চল—কালীঘাটে বেড়িয়ে আসি ।

প্যালা : আবার কালীঘাট কেন ? তোমার ধর্ম-কর্মে মতি হল নাকি ভজ্জালা ? ও-সব বলাই তো কোনও দিন ছিল না ।

ভজ্জ : বেশি বকাসনি প্যালা—বন্দা খাবি । ধর্ম-কর্ম আবার কী ? কালীঘাটে দিবি প্যাঁড়া পাওয়া যায়—চল তাই খেয়ে আসি ।

ক্যাকলা : এটা ভালো প্রস্তাব । চল, যাওয়া যাক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীঘাট : চারিদিকে গোলমাল । 'পাণ্ডা লাগবে নাকি বাবু ? এই-যে আসুন-আসুন—মাকে দর্শন করুন ।' 'একটা পয়সা দাও বাবা, মা কালী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন ।'

ভক্ত : খাতের। কালীখাটে ভক্তবলোক আসে। খালি পাতা আর ভিবিরি, ভিবিরি আর পাতা।

হাবুল : যা কইছ ভজাদা। যান গোয়ালশের সিমার-খাট।

প্যালা : চলে ভজাদা, পালাই। এর পরে জামা-কপড় কোড়ে নেবে মনে হচ্ছে।
ক্যাকলা : ওরে-বাপরে! আবার কে আসছে। একটা বিরাট সাধু সেবছি।
পেছায় চেহারা—টকটকে লাল সোখ—হাতে চিমটে—মাথায় জুটা—ফেন ঘটাবেকচ।

সাধু : (জীহ্বাসী গলায়) হর হর যম যম।

ভক্ত : উঃ—কী চাঁচাছোলা গলা! যেন যাঁড় ডাকছে।

সাধু : এই তোমার নাম কেরা হয়ে?

ভক্ত : (কণ্ঠে) আমার নাম? আমার নাম বাবা ভজহরি মুখোজো।

সাধু : ভজহরি? ঠিক আছে। দে পাঁচসিকে পরসা।

ভক্ত : পাঁচসিকে কোথায় পাব বাবা?

ক্যাকলা : আমায়ের টাক তো দাদা গড়ের মাঠে।

সাধু : (ঘেঁক) চুপ রহো।

প্যালা : ওরে বাবা।

হাবুল : চুপ কইয়া থাক ক্যাকলা। দাবস না চেহারাখান? চিমটা দিয়া অখনি বারপিঠান লাগাইব।

সাধু : এই ভজহরি। কত আছে তোর কাছে?

ভক্ত : আনা সাতেক হবে বাবা।

সাধু : আনা সাতেক? আচ্ছা, তাই দে। আর একটা বিড়ি।

ভক্ত : বিড়ি-সিগ্রেট তো আমবা খাইনে বাবাঠাকুর।

সাধু : ই। শুড বয় সেবছি। তা বেশ। বিড়ি-বিড়ি কখনও খাসনি, ওতে যজ্ঞ হয়। দে—পরসাই দে। হাঁ করে আছিস কী? দে। শিপনির—

ভক্ত : (ভয় পেয়ে) হ্যাঁ—অ্যাঁ—বাবা—দিছি—

(পরস্য কেওয়ার আগুয়াক)

সাধু : বহুত আচ্ছা। ভারি খুশি হলাম। এই নে, আশীর্বাদী জবায়ুল দে মাথায়।

হ্যাঁ রে ভজহরি, তুই এবানে কেন র্যা?

ভক্ত : আজ্ঞে বাবা, পাঁজা খেতে এসেছিলাম।

সাধু : তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাশ করবি।

ভক্ত : (জোক দিলে) দুনিয়ায় অনেক সংকাজ করেছি বাবা। মারামারি, পরের মাথার হাত ঘুলিয়ে জীমনাগের সশেষ খাওয়া, ইষ্টুলের সেকেন্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া—এ সব ভালো ভালো কাজ অনেক করেছি। কিন্তু পরোপকার তো কখনও করিনি।

সাধু : (গেটে) করিসনি মানে? তুই তো ছোঁড়া বজ্ঞ এঁড়তকো করিস। এই তো

অমায় সাত আনা পরস্য দিলি—খোলে নেই বুকি? আমার কথা শোন।
সংসার-টংসার ছেড়ে শ্রেক হওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুখ—বুকলি? সেই দুঃখ দূর করতে আনা-নুন খোয়ে লেগে পড়। আর্ডের সেবা কর—দেখবি তিন দিনেই তোর নাখে টি-টি পড়ে যাবে। সে সে—একটা বিড়ি দে—

ভক্ত : বললাম যে বাবাঠাকুর, আমরা বিড়ি-টিড়ি খাই না।

সাধু : ওহো, তাও তো বটে! বেশ বেশ, বিড়ি কখনও খাসনি। আরও শোনি—পরের উপকারে নখর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—

(গাধুর শ্রব্ধন)

প্যালা : চলে গেল! শ্রেক ভোগা দিয়ে সাত আনা পরস্য মোরে দিলে।

ভক্ত : চুপ কর প্যালা! বাজ্ঞে বকলে গট্টা লাগাব! লোকটা নিখতি মহাপুরুষ।

ক্যাকলা : কী সর্বনাশ!

ভক্ত : ঠিক বলেছে—পরের উপকারই আমি করব। কালই চলে যাব দেশের বাড়িতে—থোপাখোলায়। দারুন ম্যালেরিয়া সেখানে। কলকাতা থেকে বোতল ভরে ছরারি পাঁচন নিয়ে সবাইকে খাওয়াব। রোগ-বালিই দূর করে দেবে।

হাবুল : কয় তো সারছে। আমাগো নিজার ভজাদা শ্যাখে সম্যাসী হইল। হয়—হয়!

ভক্ত : চুপ কর, আমার মন উদাস হয়ে গেছে। তোমের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করব না। আজই চললাম থোপাখোলায় (নাটকীয় ভাবে) বিদায়—বিদায়—

তৃতীয় দৃশ্য

(থোপাখোলায় ফাতি)

ভক্ত : গ্রামে তো এসেছি! যা ভেবেছি ঠিক তাই। চারনিকেই ম্যালেরিয়া। যেখানে যাই সেখানেই মেঘি লোকে জ্বরে কোঁ-কোঁ করছে। দশ বোতল ছরারি পাঁচন এনেছি—গ্রামের রোগ তড়িয়ে তবে আমি নড়ব। ই—ই—ওই রে, পিসিমা আসছে! ভারি মুশকিল, কানে কয় শোনে—কথা কলাই দত্ত!

(পিসিমার প্রবেশ)

পিসিমা : হ্যাঁরে, এখন যে বড় দেশে এসি?

ভক্ত : এমনি এলাম।

পিসিমা : আম নিয়ে এলি। কী আম পেঙ্গি এখন অসময়ে? জ্যাংড়া না বোকাই?

ভক্ত : আম নয়। পরোপকার করতে এসেছি পিসিমা।

পিসিমা : পুরি খেতে এসেছিস? পুরি এবানে কোথায় বাবা? পাঁজা বেশে কি আর ময়দা-কয়লা কিছু আছে? ইংরেজ রাজত্ব আর বেঁচে সব নেই।

ভক্ত : ইংরেজ কোথায় পিসিমা ? এখন তো আমার স্বাধীন । মানে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ।
পিসিমা : কোট-প্যান্ট ? ছিঃ বাবা । আমি বিধবা মানুষ, কোট-প্যান্ট পরব কেন ?
বান পরি ।

ভক্ত : দুতোর : এ তো মহা ছলনা হল । ইচ্ছে করছে, পিসিমার কানে খানিক গাঁটন
ঢেলে দিই ! (ব্যঙ্গ চিহ্নে) ফাফিলাম, শেখের রোগ-বলাই ভাড়তে এসেছি ।

পিসিমা : কী কলিন, মালাই ? মালাই কোথায় পাবি বাবা ? দুধ কই ? গো-মড়কে
সব গোর উছরে গেছে ।

ভক্ত : উঃ—কী ছলনা । যাই পাঁচনের কোতল বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি :

চতুর্থ দৃশ্য

(গ্রামের গল)

ভক্ত : গাঁয়ের লোকে তো আচ্ছা বলিকা ! ওমুর্গ খেতে চায় না । বলে, ভগবানের
বেওয়া রোগ—তাজালে পাপ হয় । কী আকাট মুখ্য সব । কিন্তু এখন আমি কী
করি ? পরের উপকার আমার যে করতেই হবে । এ তো মহা মুশকিল হল ।
আরে—আরে—ওই তো ! একটা জামগাহতলায় বাসে গজানন নীতরা ঝিমুচ্ছে
দেবছি । নির্বাক ম্যালেরিয়া । ওর রোগই আগে সাগাই । বেশ হাঁ করে আছে, সিঁই
ওর মুখে খানিক পাঁচন ঢেলে—

গজানন : (জিহ্বার করে) কে রে বৌমিক । উজ্জ্বক । ওয়াক খুট-খুট— । আমার
এমন তড়ির নেশাটা বেকালুর চটিয়ে নিলে । মেঝেই খুল করে ফেলত তোকে ।

ওয়াক খুট-খুট—

ভক্ত : ইঃ—কত ভুল হয়ে গেছে । বাটা তাড়ি খেয়েছিল । ওরে বাপ রে, তেড়ে
আসছে যে । পালাই—

গজ : ওয়াক খুট । তোর মুখ ভেঙে দেব । ওয়াক—

পঞ্চম দৃশ্য

(গ্রামের গল)

ভক্ত : নাঃ,হাল ছাড়ছি না । পরের উপকার করে—মানে পাঁচ-মুজ লোককে পাঁচন
পিলিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব । এই যে সামনেই পাঁচমার বাড়ি ; চুকে পড়ি ।

(একটু পরে)

পাঁচু : উঃ । আঃ । ই-হি-হি-হি ।

ভক্ত : কী হল পাঁচমামা ? ইজিচেয়ারে শুয়ে আঃ ইঃ করছ কেন ?

পাঁচু : এই গঁটে যাব বাবা : পাঁচ পাঁচ কাথা । ওয় ।

ভক্ত : বাত ! (গেগে নিচে) তাই তো, বাত । (উৎসাহকরে) ছুর হয়নি কখনও মামা ?
মানে, ম্যালেরিয়া ?

পাঁচু : ম্যালেরিয়া হয়েছিল বই কি । গত বছর । —উঃ । আঃ । ইঃ ।

ভক্ত : ওতেই হয়ে, বুঝলে মামা, ও-ই হল রোগের লক্ষণ । ওই ম্যালেরিয়া থেকেই
সব । কিছু ভেবে না, এখনি তোমার বাত-হাত একেবারে কাত করে লিছি ।

পাঁচু : বলিস কী রে । তুই তাহলে ভাতের হয়ে এসেছিস ? কই তানিনি তো ।

ভক্ত : ভাতের কী বলছ মামা, তার চেয়ে ঢের বড় । একেবারে মড়াপুরুষ ।

পাঁচু : মহাপুরুষ ।

ভক্ত : তবে আর বলছি কী ? হাতে এই যে বোতল দেখাছ—ও ধক্কুরি । নাও হাঁ
কর ।

(কয়েক সেকেন্ড পরে)

পাঁচু : (উৎসাহ করে) ওয়াক, ওয়াক ! ওরে বাপ রে—গেছি রে—ডাকাত
রে—মেয়ে ফেললে রে ! ওয়ে, কে কোথায় আছিস রে, ওকে দু-খা-বসিয়ে দে
রে ! ওয়াক ওয়াক...

ভক্ত : আর নয়, এবার কেটে পড়ি ।

পাঁচু : (দূর থেকে চিৎকার) পাজি, ছুটো, নজর, রাফেল, খুনে, গুতা...

ভক্ত : তা পালই লাও আর যাই করো—পরের উপকার তো হয়েছে । এবার বেশি,
আর কাউকে পাই কি না ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গ্রামের গল / দূর থেকে ভক্ত : জাঁ জাঁ জাঁ)

ভক্ত : ওই যে জামগাহতলায় দাঁড়িয়ে বছর দশেকের ছোকরা চাঁচিয়েছে ।
ম্যালেরিয়াই নিশ্চয় । যাই নেখি ওর কাছে ।

(একটু পরে)

এই কী নাম তোার ?

ছেলেটা : (জঁপতে জঁপতে) লাভু ।

ভক্ত : লাভু । তা, অমন করে কানিছিস ? তোমার জালে যে হালুয়া হয়ে যাবি, আর
লাভু থাকবি নে । কী হয়েছে তোার ?

লাভু : কড়দা চাঁচি মেরেছে ।

ভক্ত : কেন ? তোকে ডবলা ভেবেছিল খুনি ?

লাভু : না । আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম ।

ভক্ত : এই কঠিক মাসে, কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলি ? শুধু চাঁচি নয় পাঁচা খাওয়ার
মতো শব্দ । ভালো কথা, তুই খুনি টক খেতে ভালবাসিস ?

লাভু : হুঁ, খুব ।

ভজ : নির্যাত ম্যালেরিয়ায় লক্ষণ । এই লাভু, তোমার জ্বর হয় ?

লাভু : হয় বই কি ।

ভজ : তবে আর কথা নেই । হাঁ কর ।

লাভু : কী আছে বোতলে ? আচার মুখি ?

ভজ : আচার বলে আচার । দুরাচার, সদাচার, কদাচার—সকলের সেরা এই আচার । হাঁ কর । হাঁ কর । চটপট !

(কয়েক সেকেন্ড পরে)

লাভু : ওয়াক, থু থু । বাবা রে, মা রে, বড়দা রে । ওয়াক । ওয়াক । দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—

ভজ : ইস । চিল চলাচ্ছে যে । ওরে কাস । একটা আবার পিঠে এসে পড়ল ।

উঃ—উঃ, ছেলেটার দেখছি তাক ফস্ফায় না, উর্ধ্বাঙ্গে পালাতে হল ।

সপ্তম দৃশ্য

(কোণাখেলার বাড়ি : ভজহরি ও পিসিমা)

পিসিমা : তুই গ্রামে এ কী উৎপাত শুরু করেছিস বাবা ভজহরি ? তোকে দেখলে সবাই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়, ছেলেপুলে দৌড়ে পাগিয়ে যায় । লোক য়ে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আটছে ।

ভজ : (গভীর গম্ভীর) পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব পিসিমা ।

পিসিমা : কী বললি ? খরের লোকের কান কেটে নিবি ? (মজল্লা কুড়ল) কী সর্বনাশ । ওগো, আমার কী হল গো । আমায়ের ভজহরি যে পাগল হয়ে গেল গো ।

ভজ : দুগোর, কথা কওয়াই ককমারি ! বেরিয়ে পড়ি বাড়ি থেকে—

অষ্টম দৃশ্য

(পথ)

ভজ : কী অবতজ্ঞ নরোধম দেশ । এই দেশের উপকারের জন্যে মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ কেউ আমার কলর বুঝবে না ? ছিট ছিট । এইজন্যেই বেশ আজ পরাধীন—ধুতি, স্বাধীন । কিন্তু কী করা যায় ? কী ভাবে উপকার করি ? পাঁয়ে তো যাওয়া যাচ্ছে না, লোক পিটিয়ে চাপটা করে দেবে । কার উপকার করি এখন ?

(একটু পরে)

আরে, নিমগ্নহতলায় ওই তো তিনটে ছাগল দিমুচ্ছে । ভারি খারাপ লক্ষণ ! এখানেকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া ! ছাগলকেও ধরেছে । ধরাই স্বাভাবিক !

আহা অবোলা জীব ! কেউ ওদের দুঃখ বোঝে না ! আহা—চুক চুক ! ছাগলকেই তবে পাঁচন খাওয়াই । মানুষের মতো ওরা অবতজ্ঞ নয় । তোড় মারতে আসবে না । আজ থেকে এই অবোলা জীবের উপকার করাই আমার দ্রত । যাই ছাগল দিয়েই তবে শুরু করি—

(একটু পরে ছাগলের জাক—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—)

আঃ, ছোটকট করছিস কেন ? তোর ভালোর জন্যেই তো ! (ছাগলের জাক—হ্যা—হ্যা—হ্যা—) এবার দু' নম্বর । আঃ, বাটা তো ভাবি নছার ! নে খা না ! (ছাগলের জাক) চলে আস তিন নম্বর । খেয়ে নে শগুড়রী পাঁচন—

(তিনটে ছাগলের সমস্ত জাক—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—)

লোক : (দূর থেকে ডিঙ্কার করে) ওগো, সেই খুঁনে ডাকডাটা গো । আমার তিনটে ছাগলকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে রে—

ভজ : সর্বনাশ ! ছাগলের মালিক দেখছি ! নাঃ, সাটকাতে হল ।

লোকটা : (চৌকিয়ে) আমিও হলধর সাঁপুই । সহজে ছাড়বে না । মাংসা করব, জেল খাটাব ! (ছাগলের জাক) হায় হায়, আমার ছাগল মুক্তি গেল !

নবম দৃশ্য

(অদলত)

শেখাধা : ফরিয়াদি হলধর সাঁপুই হা—জির—

হলধর : এই যে হজুব, হাজির !

উকিল : ধর্মবিতার । হজুর মাননীয় জাজ বাহাদুর !

জজ : অমন করে চৈচাবে না মশাই, পিলে চমকে হায় ! আপনার মকেলের নালিশ বলুন ।

উকিল : ধর্মবিতার, এই যে কাঠগড়ায় আসামী ভজহরি মুখোজো দাঁড়িয়ে আছে, ও একটা মহা পাখণ্ড । ও যে অন্যায় করেছে তা আমাদের দরখাস্তে বিশদভাবেই লেখা আছে । অবোলা জীবের ওপর ভজহরি যে ভীষণ অত্যাচার করেছে, তার নিজের ভাষা নেই । একটা ছাগল পরন্ত থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না । আর একটা সমানে বমি করছে আর একটা তিন দিন খরে সামনে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদির একটা টাকখড়ি সূক্ত চিবিয় ফেলেছে ।—কী হে হলধর—তাই নয় ?

হলধর : (কোঁপ-কোঁপ করে) আজ্ঞে ধর্মবিতার, জাজসাহেব, উকিলবাবু যা বলেছেন সবই সত্যি । আমার টাকখড়িটা খুব ভালো ছিল স্যার । কী শক্ত ! আমার ছেলে সেইটে টুড়ে-টুড়ে আম পাড়ত । চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা । (ভেউ ভেউ, হনহন করে) নানা : একটু পরে) ঘড়ি নয় যাক হজুর, কিন্তু আমার

অমন তিন-তিনটে ছাগল ! বুড়ি পাগল হয়ে গেল হুজুর, একেবারে উদ্‌ম পাপল !
 জজ : আরে ছাগলতন ! আরে বাপু, তুমিও তো দেখছি একটা পাপল ! ছাগল
 কখনও পাপল হয় ! সে যাক ! অপরাধের গুণগুণ তিজ্ঞা করে আমি আসামী
 ভজহরি মুখজ্যেকে তিনটাকা জরিমানা করলাম—এই টাকায় হুলধরের ছাগলেরা
 রসগোল্লা খাবে ।

সং যো জন

দশম দৃশ্য

(চট্টোজাঙ্গের জোয়াক)

ভজ : প্যালা !

প্যালা : হাজির !

ভজ : হাবুল !

হাবুল : সামনে খাড়িওয়া মইছি ।

ভজ : ক্যাবলা !

ক্যাবলা : রোজেন্ট স্যার—বুড়ি এই যে মতশয় ।

ভজ : পোন, মনটা বেজায় খিটড়ে গেছে । বুড়লি, সংসারে কারও উপকার করতে
 নেই ।

প্যালা : নিশ্চয়ই না ।

ক্যাবলা : উপকারীকে বাঘে খায় ।

হাবুল : বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে নিম্না

খামকা খামেলা খাড়িওয়া মইব কী !

ভজ : যা কইছস ! (হাঁচক গলায়) কুকলি, আমি আর-একখানা নতুন কর্পোরিডয়
 লিখব ! তার প্রথম পাঠ থাকবে : কখনও পরের উপকার করিও না !

ক্যাবলা ! সাধু ! সাধু !

ভজ : (গর্জন করে) বরকলার, সাধু-ফালুর নাম আমার কাছে করবি নে । ওই সাধুর
 জানেই তো এত কেসলক্ষারি ! একবার সাধুকে যদি হাতের কাছে পাই, তা হলে
 ওরই একদিন কি আমারই একদিন ।

কিছু কথা : বই নিয়ে, টেনিদাকে নিয়ে

টেনিদাকে নিয়ে লেখা যে সমূহ গল্প-উপন্যাস-নাটক এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হল, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে বচনকাল-অনুসারে সেকলিকে সাজানো গেল না। তার বদলে, পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে টেনিদার কীর্তিকাহিনীগুলি নানাভাবে স্থতিয়ে দেবে ধারাবাহিকতার একটি নতুন চেহারা এ-গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রয়াস কতটা সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে, জানি না। বিশেষত, গল্পের ক্ষেত্রে। প্রথম কোনটি, তা চিহ্নিত করা প্রায় দুশোখ। অনুরোধ রইল—এ-বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য যদি কারও জানা থাকে, প্রকাশকের ঠিকানায় তিনি যেন অনুগ্রহ করে তা জানিয়ে দেন। এ-বইয়ের ভবিষ্যৎ-সংস্করণে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটানো হবে।

উপন্যাস হিসেবে, 'চার মূর্তি'ই টেনিদা-সিরিজের প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৭ সালে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে 'চার মূর্তি' ফখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, 'ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' লিখেছিলেন, "ছোটদের একটুখানি খুশি করবার আশা নিয়ে 'চার মূর্তি' ধারাবাহিকভাবে 'শিশুসাধী'তে লিখেছিলাম। ছোটরা আশঙ্কিতভাবে সাড়া দিয়েছে। সেই ভরসাতেই বইয়ের আকারে প্রকাশ করা গেল।"

'চার মূর্তির অভিযান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে। এটিও অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে প্রকাশিত। এ-বইয়ের 'ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' নিজেই নাম ব্যবহার করেননি, টেনিদা-কাহিনীর কথক প্যালালামের জবানিতেই দারুল মজাদার একটি ভূমিকা লিখেছেন :

ছোট ছোট বন্ধুরা,

পটলডাঙার 'চার মূর্তি' এখন বড় হয়েছে, তারা কলেজে পড়ছে। তাই সেনিন টেনিদা এসে শ্যাসিয়ে কলে, 'দাখ্ প্যালা, আমাদের কীর্তি-কাহিনী নিয়েই যে সব উপন্যাস লিখছি, তাতে লোকের কাছে আর মাল থাকবে না। ফের যদি তুই আমাদের নিয়ে উপন্যাস লিখবি তাহলে এক চড়ে তোর নাক নাসিকে পাঠিয়ে দেব।' হাবুল সেন সঙ্গে-সঙ্গে কলে, 'হু, সত্য কইছ।' আর ক্যাকা দম্ভা করে কলে, 'মধ্যে মধ্যে দু-একটা গল্প লিখতে পারিস—নইলে অভ্যুদয়ের অমিয় চক্রবর্তী আবার রাগ করবে।' মাথা চুলকে কললুম, 'তখাঙ্ক।'

তোমরা তো টেনিদাকে জানেই। আমি রোগ-পটকা প্যালালাম—তাকে